রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন

কৃষ্ণা রায়

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ ভূমিকা ॥

রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন গত শতকের এক বিখ্যাত নারী বিজ্ঞানী, বেঁচে থাকতে যাঁর প্রার্থিত মর্যাদা পাওয়া হয়নি, লন্ডনের উইলেসডেন জিউইস সিমেটেরিতে তাঁর সমাধি ফলকের ওপর লেখা আছে, "Scientist". তারপরে খচিত রয়েছে আর-একটি বাক্য "Her research and discoveries on viruses remain of lasting benefit to mankind".

বাস্তবিক, একথা বললে ভুল হবে না, তাঁর গবেষণার আলোয় সমস্ত মানবজাতি উপকৃত হয়েছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষের কাছে তিনি ডি এন এ (DNA) অণুর গঠনের অন্যতম আবিষ্কারক, অকালে মৃত এক উপেক্ষিত চরিত্র। এ কাজের জন্য ১৯৬২ সালে, অন্য তিন কুশীলব জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক ও মরিস উইল্কিন্সের সঙ্গে ফিজিওলজি ও মেডিসিন বিভাগে নোবেল প্রাইজ পাওয়া তাঁর হয়নি। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর খ্যাতি আকাশচুম্বী হয়েছে। অবিবাহিত, সম্ভ্রান্ত বংশীয় এই

ইহুদি নারীটি তাঁর কাজের মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা-মলিকিউলার বায়োলজির সূচনা করেছিলেন। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজির সীমারেখা অতিক্রম করে তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের নিরলস গবেষণা, মানব সভ্যতায় বিশেষ এক চিহ্ন রেখে গেছে। কয়লা নিয়ে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার পাশাপাশি তিনি ভাইরাস সম্পর্কেও আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কাজের সূত্র ধরেই পরের প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা ডি এন এ (DNA)-র গঠনের সিকোয়েন্সিং, এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ভাইরাসের গঠন সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। সে তালিকায় আজকের পৃথিবীতে বহু ব্যাপ্ত সার্স কোভ ২ (SARS COV 2) ও আছে।

ডি এন এ (DNA) অণুর গঠনের আবিষ্কারে তাঁর অবদান যথাযথ ভাবে স্বীকৃত হয়নি ঠিকই, এ নিয়ে রোজালিন্ডের জীবনের সেই দুরন্ত দুবছরের শ্রমসাধ্য গবেষণার ইতিহাসের অংশটি নিঃসন্দেহে বেদনার। পরবর্তী কালে (যদিও তাঁর জীবদ্দশায় নয়) যদিও সহযোগী বিজ্ঞানী ক্রিক স্বীকার করেছিলেন, "the data which really helped us to obtain the structure was mainly obtained by Rosalind Franklin." তবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এখন আর এক পরাজিত নায়িকা হয়ে নয়, রোজালিন্ডকে মানুষ মনে রেখেছে তার আরও বহুমাত্রিক কাজের জন্য। আর তিনটি বই বিশেষ ভাবে তাঁকে আরও বেশি করে মানুষের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে। এর প্রথমটি একটি বিখ্যাত নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীর স্মৃতিকথা, যাকে উপন্যাস-ই বলা চলে, যে বইতে রোজালিন্ডের বিজ্ঞানী পরিচয়ের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর চরিত্রের অজস্র ত্রুটি বিচ্যুতি এবং তার মেধার দীনতা। বইটির নাম, "দ্য ডি এন এ ডবল হেলিক্স",

লেখক জেমস ডি ওয়াটসন। বেস্টসেলার এই বইতে ওয়াটসন তাঁর প্রতি অত অকরুণ মন্তব্য না করলে মানুষ হয়তো রোজালিন্ড নামক বিজ্ঞানীটিকে ভুলেই যেত। অন্য দুটি বই তাঁর-ই জীবনী। প্রথমটি তাঁর আমেরিক্যান বান্ধবী আন্যে সায়ের এর (Anne Sayre) লেখা, বই-এর নাম Rosalind Franklin and DNA, আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে, ১৯৭৫-এ প্রকাশিত। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ বই-এর তালিকায় বা প্রদর্শনীতে স্থান পায়নি। *এও জানা যায় British Museum Natural Science DNA exhibit in the 1960s,* নামক অনুষ্ঠানে রোজালিন্ডের নাম স্থান পায়নি। তাঁর এক বন্ধু ২০০০ সালের মার্চ মাসে লন্ডনের কিংস কলেজে এ বিষয়ে অভিযোগ জানালে তাদের নতুন এক অট্টালিকার নামকরণ হয় রোজালিন্ড ও উইল্কিন্সের স্মৃতিতে। আর দ্বিতীয়টির লেখক ব্রেন্ডা ম্যাডক্স, (Brenda Maddox)। বই-এর নাম Rosalind Franklin : The Dark lady Of DNA প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে।

বিজ্ঞানের গবেষণায় এখনও মেয়েরা জীবনে খুব বেশিদিন লেগে থাকতে পারেনা, পরিবার, সমাজ এসে বাদ সাধে, হয়তো বা সে নিজেও তেমন করে জুড়ে থাকতে পারেনা। যারা পারেন, তারা ব্যতিক্রমী। মূল স্রোতে তাদের বহমানতা খুব বেশি দৃশ্যমান নয়। রোজালিন্ড পেরেছিলেন, আটপৌরে সংসারের প্রলোভন দূরে রেখে, ভগ্ন স্বাস্থ্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। রোজালিন্ডের জীবনের করুণ নিয়তি নোবেল প্রাইজ অপ্রাপ্তিতে নয়, তার চেয়েও বড়ো দুর্ভাগ্য, তার মরণোত্তর জীবনের কুড়ি থেকে চল্লিশ বছরের গবেষণার জগতের ইতিহাসে তাঁকে বিস্মৃত থাকা, এ কথা এক সময় বলেছিলেন এখনকার প্রজন্মের এক নারী গবেষক। রোজালিন্ডের গবেষণার ফসল আজকের মলিকিউলার

বায়োলজির বিস্তৃত গবেষণা, জিন নিয়ে কাজের ব্যাপ্তি। তাঁর গবেষণার মৌলিক ভিত্তিভূমিতে পা না রাখতে পারলে পরবর্তী গবেষকদের হয়তো এইসব নতুন শাখায় সাধনার জন্য আরও বহুদিন অপেক্ষায় থাকতে হত।

দুহাজার কুড়ি সালে তাঁর জন্মের একশো বছর পূর্তিতে এই অসামান্য নারী বিজ্ঞানীটির জীবন ও সাধনার প্রচার অবশ্যই বড়ো প্রাসঙ্গিক।

কৃষ্ণা রায়
প্রোফেসর ও প্রিন্সিপাল।
বেথুন কলেজ, কলকাতা

সূচীপত্র

বাল্য ও প্রথম শিক্ষা	১৫
উচ্চশিক্ষা	১৯
গবেষণার প্রথম প্রহর	২৩
কিংস কলেজের দিন	২৫
নতুন ল্যাবরেটরি, নতুন সাধনা	৩৪
মানুষ রোজালিন্ড	৩৯
ডি এন এ মডেল প্রস্তুতির নেপথ্য কাহিনি : প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে	৪৪
লিংগ বৈষম্য-এর শিকার : কতটা সত্যি	৫১
শেষের দিনগুলি	৫৫
মরণোত্তর পুরস্কার ও সম্মান-স্বীকৃতি	৬০
রোজালিন্ডের গবেষণা সন্দর্ভ	৬৮

● বাল্য ও প্রথম শিক্ষা :

তার পুরো নাম রোজালিন্ড এলসি ফ্র্যাঙ্কলিন। ২০২০ সালে তার জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল। সারা পৃথিবীতে বেশ কিছু মানুষ বিশ্বাস করে বিজ্ঞানের গবেষণার জগতে নারী বলেই তিনি তার প্রতিভার প্রার্থিত মর্যাদা পাননি। রামায়ণে লক্ষণের স্ত্রী উর্মিলাকে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন 'কাব্যে উপেক্ষিতা', রোজলিন্ডও নাকি তেমনই বিজ্ঞানে উপেক্ষিতা। কেন সে কথা বলা হয়, সেটি জানার আগে, আমরা দেখে নিই তার স্বল্পায়ু জীবনের কথা। এই পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন মাত্র সাঁইত্রিশ বছর আর কয়েক মাস। কিন্তু তাঁর গবেষণার আলোয় আমরা পেয়েছি এক পরম জ্ঞান, মানুষের সমস্ত দেহগত, গুণগত, শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হয় এক বিশেষ জৈব অণুর মাধ্যমে, যাকে আমরা চিনি ডি এন এ (DNA) নামে। গতশতকে জীববিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা মলিকিউলার বায়োলজি যাদের গবেষণায় সমৃদ্ধ হয়েছে রোজালিন্ড তাদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয়।

রোজালিন্ডকে নিয়ে আলোচনার আগে বরং দেখে নেওয়া যাক ডি এন এ (D.N.A) কি? কেই বা প্রথম এটিকে আবিষ্কার করেছিলেন? ডি এন আ বা ডি-অক্সি-রাইবো-নিউক্লিও আসিড হল প্রকৃতপক্ষে বেশ বড় সড় এক ধরণের অণু যার মধ্যে আছে তিনটি আলাদা জাতের রাসায়নিক বস্তু। প্রথমত এক রকমের শর্করা বা সুগার, যার নাম ডি-অক্সি রাইবোস, দ্বিতীয়ত এক ধরণের নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারক, যারা আবার দু রকমের। একজনের নাম পিউরিন, অন্যজন হল পিরিমিডিন আর তৃতীয়ত একটি ফসফেট যৌগ, এদের একত্রে

বলা হয় নিউক্লিওটাইড। এ রকম অজস্র নিউক্লিওটাইড নিয়ে গড়ে ওঠে একটি ডি এন এ অণু। সাধারণ ভাবে এদের অবস্থান দেহ কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে। রোজালিন্ডের জন্মের ঢের আগে সুইডিশ বিজ্ঞানী ফ্রেড্রিক্ মিয়েসচার রক্তের মধ্যে থাকা শ্বেত রক্তকণিকা লিম্ফোসাইট-এর গঠন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ঘটনাচক্রে কোষের নিউক্লিয়াস থেকে একটি নতুন অণু আবিষ্কার করে ফেলেন। তার নাম দিয়েছিলেন নিউক্লিন (Nuclein)। যার মধ্যে ছিল নিউক্লিক আসিড আর প্রোটিন। পরবর্তীকালে আরও অনেক বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডি এন এর সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা গড়ে ওঠে। আর ১৯৪০ সালের আগে পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাস করতে চায়নি এই ডি এন এ অণুর ভেতরেই লুকিয়ে আছে বংশানুক্রমে আমাদের অজস্র বৈশিষ্ট্যের অধিকার অর্জনের কথা।

এবারে ফিরে আসি রোজালিন্ডের জীবন কথায়। জন্মে ছিলেন আজ থেকে একশো বছর আগে লন্ডনের নটিংহিল অঞ্চলে ২৫ জুলাই, এক সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও ধনী ব্রিটিশ ইহুদী পরিবারে, যারা আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। বাবা এলিস আরথার ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন রাজনৈতিকভাবে মুক্তমনা মানুষ, একটি ব্যাঙ্কের মালিক এবং ওয়ার্কিং মেন্স কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষক। কলেজে তিনি পড়াতেন ইলেক্ট্রিসিটি, চুম্বকের ধর্ম আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। রোজালিন্ডের পরিবারটি ছিল বেশ অভিজাত। তার বাবার কাকা হারবার স্যামুয়েল ছিলেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের প্রথম ইহুদি প্রতিনিধি। তার পিসি হেলেন ছিলেন ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় নেত্রী, নারী মুক্তি আন্দোলন নিয়ে সমকালে যথেষ্ট মুখর থাকতেন আর কাকা হিউজ ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন মানুষের মুক্তি আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। এই কাকার প্রথমা স্ত্রী এলসি, ১৯১৮ সালে স্প্যানিস ফ্লুতে মারা যান, তাঁর স্মৃতিতে দুবছর পরে জন্ম নেওয়া বাড়ির প্রথম কন্যাসন্তান

রোজালিন্ডের নামের মধ্যে এই এলসি নামটি আদর করে স্থান দেয় তার পরিবার। মায়ের নাম ম্যুরিয়েল ফ্রান্সিস ওয়ালে। বাবা মায়ের দ্বিতীয় সন্তান রোজালিন্ডের ছিল আরও তিন ভাই আর এক বোন। বড়োভাই ডেভিড বয়সে মাত্র এক বছরের বড়ো, পরের দুই ভাই যথাক্রমে কলিন ও রোল্যান্ড, সব শেষে নয় বছরের ছোটো বোন জেনিফার। পরিবারে বাবা ও মা দুজনেই বড়ো উদার চরিত্রের। নাজী বাহিনির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া ইহুদি শরণার্থীদের আশ্রয়, সাহায্যে সব সময় তাঁরা তৎপর থাকতেন, কিছু কিছু পালিয়ে আসা শিশু ইহুদিদের নিজের সন্তানদের মতো বাড়িতেও লালন পালন করতেন। ছোটোবেলা থেকে এসব দেখে বড়ো হয়েছে রোজালিন্ড। তবে শিশুকাল থেকেই মেয়েটা বড়োই মেধাবী। পুতুল খেলায় তার মন নেই, বরং ভালোবাসে হাতের কাজ, আঁকাজোকা আর হরেক রকম খেলা। ছয় বছর বয়সে ভাই রোল্যান্ডের সঙ্গে সে পড়তে গেল পশ্চিম লন্ডনের এক প্রাইভেট স্কুল নর্টল্যান্ড প্লেস স্কুলে। সে সময়েই তার মেধার কথা স্মরণ করেছেন পিসি হেলেন, 'রোজালিন্ড আশ্চর্য রকম বুদ্ধিমতী, সারা দিন মনের আনন্দে অঙ্ক কষে যায় আর সে সব অঙ্ক নিশ্চিত ভাবে সঠিক হয়'। তখন থেকেই সে ভালোবাসে ক্রিকেট, হকি। নয় বছর বয়সে তাকে পাঠান হল সমুদ্রের ধারে, সাসেক্স অঞ্চলের বোর্ডিং স্কুল লিন্ডরস স্কুল ফর ইয়ং লেডিস। তার বাড়ির লোকেরা চাইছিল রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তার একটি ভালো পরিবেশে থাকা খুব দরকার। সেখানে দু-বছর কাটানোর পর সে ভর্তি হল পশ্চিম লন্ডনের হ্যামারস্মিথ অঞ্চলে সেন্ট পলস গার্লস স্কুলে, বয়স তখন এগারো।

প্রাথমিক ইস্কুলের পাঠ দেওয়ার পর এই স্কুলে ভর্তি করার কারণ একটাই। এখানে মেয়েরা অঙ্ক আর বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার পাঠ নিতে পারবে। স্কুলে সে নিয়মিত ভালো ফল করে। ভাষা শেখাতেও তার খুব মন, অল্প আয়াসে

শিখে ফেলল ল্যাটিন, জার্মান আর ফরাসি ভাষা। আর সে ভালোবাসে খেলাধুলো। প্রতি বছর ক্লাশে সে ফার্স্ট হয়, প্রচুর প্রাইজ নিয়ে বাড়ি আসে, কিন্তু গানের বেলায় মেয়ের তেমন প্রতিভা দেখা গেল না। সে না হোক, সে তো আর ভবিষ্যতে গায়িকা হবে না। তার লক্ষ্য বড়ো হয়ে বিজ্ঞানী হওয়া। পনেরো বছর বয়সেই সে ঠিক করে ফেলল জীবনের সেই লক্ষ্য। বাবার এ ব্যাপারে মতো নেই। বাবা নিজেও চেয়েছিলেন বিজ্ঞানী হতে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভুমিতে সে আশা অপূর্ণ রয়ে গেছে। তাছাড়া মেয়েদের বিজ্ঞানী হওয়া অত সোজা নয়। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, সবাই তো আর ম্যাডাম কুরী হতে পারে না। মেয়ে কিন্তু অদম্য। স্কুলের পাঠ ভালো ভাবে সাংগ করে, ছয়টি বিষয়ে ডিস্টিংশন নিয়ে ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করল রোজালিন্ড। স্কলারশিপ হিসেবে পেল বছরে ত্রিশ পাউন্ড আর তিন বছরের জন্য। বাবার ইচ্ছে এই পুরো টাকাটাই মেয়ে দরিদ্র রিফিউজি ছাত্রছাত্রীদের বিলিয়ে দিক। তাদের পরিবার সব সময় আর্ত মানুষের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। রোজালিন্ড কি তার অন্যথা করতে পারে? পরবর্তীকালে তার মা বলেছিলেন, সারাজীবন রোজালিন্ড নিজে যা ভেবেছে তাই করেছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীনে সেকালে ছিল দুটি মেয়েদের জন্য কলেজ। নিউনহ্যাম কলেজে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াতে তার বাবার কিছুটা আপত্তি ছিল, তিনি চেয়ে ছিলেন প্রথাগত ভাবে তখন মেয়েরা যা পড়ে সে তাই পড়ুক। রোজালিন্ড কিন্তু সে পথে হাঁটেনি।

● উচ্চ শিক্ষা :

স্কলারশিপ পাওয়ার গৌরব নিয়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিওনহ্যাম কলেজে ভরতি হলেন রোজালিন্ড। উদ্দেশ্য সেখানে ন্যাচারাল সায়েন্সে ট্রাইপোস করা। ট্রাইপোস মানে, সে সময়ে কেম্ব্রিজে পড়তে হতো তিনটি মূল বিষয়, বিজ্ঞানের ইতিহাস, বিজ্ঞানের দর্শন আর ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রির মতো কোন বিশেষ বিষয়। রোজালিন্ড বেছে নিলেন কেমিস্ট্রি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলা কালীন অবস্থায় কেটেছে তার কলেজ জীবন। বিজ্ঞানীরা তখন যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কলেজের শিক্ষকদের অনেকেই তাই পড়াতে পারছেন না। যে জার্মান শিক্ষকেরা বায়োকেমিস্ট্রি পড়াতেন, তারা অনেকেই মারা গেছেন। কেম্ব্রিজে তখন প্রচুর যুদ্ধ ফেরত শরণার্থী শিক্ষক এসেছেন। এদেরই একজন ছিলেন ফরাসি বিজ্ঞানী আদ্রেঁ ওয়েল (*Adrienne Weil*)। তিনি ছিলেন মাদাম কুরির প্রাক্তন ছাত্র। এরই মাধ্যমে রোজালিন্ডের ফরাসি ভাষায় বাক্যালাপ চালানোর দক্ষতা বাড়ল, জীবনের উদ্দেশ্যও অনেকাংশে স্থির করা গেল। এখানে তার সঙ্গে আলাপ হল স্প্রেক্টোস্কোপি বিশেষজ্ঞ বিল প্রাইসের সঙ্গে। এই স্পেক্ট্রোস্কোপি নিয়ে পরে সে আরও পড়াশুনো করেছিল। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করতে হয় ১৯৩৯ সালের শরত কালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে তাকে বলা হয়েছিল, পড়াশুনো ছেড়ে যুদ্ধের কাজে সামিল হতে। কিন্তু সে রাজী হয়নি। সে তো ভূমিকন্যা হয়ে থাকতে চায় না, করণিকের পেশাও তার জন্য যোগ্য নয়, সে বরং কেমিস্ট্রি নিয়েই ডিগ্রি পেতে চায়।

নিওনহ্যাম কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির সাম্মানিক গ্র্যাজুয়েট হলেন রোজালিন্ড ১৯৪১ সালে। বি এ উপাধি তার পাওয়া হয়নি।